একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU
ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158
An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

# Anti-Scriptural Movement and Ramanath Roy's Short Stories: An Analytical Review

# শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন ও রমানাথ রায়ের ছোটগল্প: একটি বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা

Name of the Author: SANDEEP XESS
Affiliation: Research Scholar, Bengali Department, The Sanskrit College And University, Kolkata, West Bengal, India

**Abstract:** This paper examines the Shastrabirodhi movement and the short stories of Ramanath Ray as a major turning point in modern Bengali literature. Literary movements often emerge by rejecting established conventions and opening new paths for artistic expression; in this sense, the Shastrabirodhi movement of the 1960s played a significant role in transforming the form and philosophy of the Bengali short story. It challenged traditional narrative structure, realism, plot-centered storytelling, and accepted literary values. At the centre of this movement stood Ramanath Ray, whose writings combined formal experimentation, psychological depth, irony, fantasy, absurdity, and social criticism. His stories moved away from conventional causality and instead explored fragmented experience, loneliness, alienation, political anxiety, and the instability of modern life. Through works such as *Kankar*, *Selai Machine*, *Tinterlar Ghar*, *34-24-36*, and *Phire Elen Mahadev*, Ray portrayed the tensions of everyday existence while also exposing corruption, emotional isolation, the collapse of values, and the oppressive nature of the state. His use of fantasy and magical realism did not distance literature from reality; rather, it created a sharper mode of engaging with social truth. Therefore, Ramanath Ray's short fiction not only represents the spirit of the Shastrabirodhi movement but also establishes a distinctive literary vision that reshaped Bengali short story tradition.

**Keywords:** Shastrabirodhi movement, Ramanath Ray, Bengali short story, literary modernism, anti-tradition, magical realism, fantasy, absurdity, social criticism, narrative experiment

# শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন ও রমানাথ রায়ের ছোটগল্প: একটি বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা

সন্দীপ খেস

সাহিত্য আন্দোলন হলো সেই প্রচেষ্টা যা সাহিত্যের গতানুগতিক ধারাকে অস্বীকার করে নতুনত্বের সন্ধানে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং সাহিত্যের গতিপথ পরিবর্তন করে। ইতিহাসে আমরা লক্ষ করি যে , শিল্প-সাহিত্যের পরিসরে নানা ধরনের আন্দোলন সাহিত্যের ধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে দিয়েছে। বাংলা সাহিত্য তথা সমগ্র সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা কতটা ? তার উত্তর যাই হোক না কেন সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে সাহিত্যিকদের দ্বারা শিল্প সাহিত্য নিয়ে নানান সময়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। কাব্য-কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক সমস্ত শিল্প অঙ্গনেই এই বিষয় লক্ষ করা যায়।

উনিশ শতকের শুরুর দিকে বাংলা আখ্যান লেখার সূত্রপাত হলেও বাংলা সার্থক উপন্যাস পাওয়া যায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় -এর 'দুর্গেশনন্দিনী'র (১৮৬৫) হাত ধরে এবং বাংলায় প্রথম সার্থক ছোটগল্পের উদ্ভব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে হলেও পরবর্তীতে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় , তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় , বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ছোটগল্পকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করেন। তাঁরা সরাসরি কোনো আন্দোলন থেকে উঠে আসেননি; বরং বাংলা সাহিত্যে নিজেদের নিজস্ব একটা ঘরানা তৈরি করেছেন। বিশ শতকের শুরুর দিকে 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'কবিতা', 'পরিচয়' প্রভৃতি পত্রিকায় বাংলা কবিতা ও গল্পকে কেন্দ্র করেও আন্দোলন দেখা দিয়েছিল। বাংলা সাহিত্য চর্চার ধারায় বিশ শতকের ষাটের দশক এক বিশেষ গুরুত্ব বহন করে, যখন একদল তরুণ লেখক প্রচলিত সাহিত্যিক আদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। স্বাধীনতা পরবর্তী ষাট, সত্তর এবং আশির দশকে ছোটগল্পকেন্দ্রিক আন্দোলনগুলি বাংলা সাহিত্যকে উত্তাল করেছিল , এবং সাহিত্যে নতুন দিশা দেখিয়েছিল। এই আন্দোলনগুলির মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য **শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন (১৯৬৬)** যা প্রচলিত ছোটগল্পের শাস্ত্র বা নিয়মনীতি ও সাহিত্য-সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ । এই আন্দোলন বাংলা ছোটগল্পকে নতুন সাহিত্যরূপ দান করেছে। গল্প এখন আর কেবল বলার জন্য নয় ; গল্প এখন পাঠককে ভাবায়, প্রশ্ন তোলে এবং নতুন করে দেখার পথ গড়ে তোলে।

'শাস্ত্রবিরোধী' আন্দোলনের অন্যতম মুখপত্র 'এই দশক' পত্রিকা , প্রথম প্রকাশ পায় ১৯৬৬ সালে। অনিয়মিতভাবে পত্রিকাটি প্রকাশিত হতে থাকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত , ষোল বছরের ইতিহাসে মাত্র ২৪টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। তবে আশিস ঘোষ সম্পাদিত 'বিদিশা' পত্রিকার কয়েকজন লেখক প্রথম 'শাস্ত্রবিরোধী' ছোটগল্প রচনায় প্রয়াসী হন কিন্তু 'বিদিশা' পাঁচটি সংখ্যা প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে গেলে সেইসব তরুণ লেখকদের উদ্যোগে 'এই দশক' নামে এক ক্ষীণকায় বুলেটিন বেরিয়েছিল ১৯৬২ সালে , যার দাম ছিল মাত্র দশ পয়সা। রমানাথ

রায়ের সম্পাদনায় এই বুলেটিনটি তরুণ লেখকদের জন্য একটি অন্যতম প্ল্যাটফর্ম হয়ে ওঠে , যা ১৯৬৪ পর্যন্ত নয়টি সংখ্যা প্রকাশ করে।

তরুণ কবি ও গল্পকারদের এক ছোট্ট দলকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এই উদ্যোগ। ১৯৬৪ সালে বুলেটিনটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গেলে , সেই দলের কবিরা ১৯৬৫ সালে 'শ্রুতি' নামে একটি কবিতা পত্রিকা প্রকাশ করেন। তবে গল্পকাররা থেমে থাকেনি। ১৯৬৬ সালে , তাঁরা আবারও ফিরে আসেন 'এই দশক' নামে , যা শাস্ত্রবিরোধী গল্পের মুখপত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পত্রিকার পুরো যাত্রায় , ২৪টি সংখ্যার মধ্যে কোনো সংখ্যাতেই সম্পাদকের নাম উল্লেখ ছিল না , যা একধরনের অনন্যতা প্রদান করেছিল পত্রিকাটিকে। তবে ১৯টি সংখ্যার প্রকাশক ছিলেন আশিষ ঘোষ , এবং ২১ ও ২৪ সংখ্যার প্রকাশক সুব্রত সেনগুপ্ত। একমাত্র ২০তম সংখ্যাটি প্রকাশকহীন ছিল। 'এই দশক' একদল সাহসী তরুণের সৃষ্টিকর্ম, যাঁরা শাস্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, সাহিত্যে নতুন ধারা প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় ছিলেন।

শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন বলতে প্রথা ভাঙার এক সাহসী সংকল্পের প্রতিফলনকেই বোঝানো হয়। যে শাস্ত্র সমাজের মান্য প্রথা ও সংস্কার দ্বারা রচিত , তা একসময় নিজেই নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে জীবন ও শিল্পকে। প্রতিভাবান লেখক ও শিল্পীর মনের অভিব্যক্তি যখন একটি নির্দিষ্ট ছকে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তখন সেই ছকই প্রথায় পরিণত হয়, আর ক্রমে তা হয়ে ওঠে শাস্ত্র। কিন্তু জীবনের পরিবর্তমান চক্রে , বিশ্বাসের বিন্দুগুলি যখন তার পুরোনো অবস্থান থেকে সরে আসে, তখন সেগুলিকে সেই শাস্ত্রের ফ্রেমে বাঁধা আর সম্ভব হয় না। সেখানেই দেখা দেয় শাস্ত্র ভেঙে নতুন শাস্ত্র গড়ার আকাঙ্ক্ষা। ষাটের দশকের বাংলা সাহিত্যেও ঠিক এইভাবে দেখা দেয় নতুন সাহিত্য আন্দোলনের ঢেউ যা 'হাংরি', 'শ্রুতি', আর 'শাস্ত্রবিরোধী' প্রভৃতি আন্দোলন নামে পরিচিত । এর মধ্যে 'শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন ' বিশেষভাবে ছোটগল্পের মাধ্যমেই বিকশিত হয়। যদিও এই আন্দোলনের লেখকরা উপন্যাসের ক্ষেত্রেও সমান দক্ষতায় তাঁদের প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়েছেন। তাঁদের উপন্যাসগুলো ছিল আঙ্গিক ও বক্তব্যের দিক থেকে একেবারেই প্রথাবিরোধী, সমাজের প্রচলিত ধারণাগুলোর বিরুদ্ধে ছিল তাঁদের লেখনী।

শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের লেখকরা নিজেদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টভাবে নির্মাণ করেছিলেন তাঁদের সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে। এই দার্শনিক প্রতীতির প্রয়োগ তাঁরা নিজেদের লেখায় পরীক্ষা করেছেন , এবং সৃজনশীলতার নতুন মানচিত্র তৈরি করেছেন। 'এই দশক' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদেই শাস্ত্রবিরোধী গল্পের স্বরূপকে চারটি বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়, যা ছিল আন্দোলনের এক সুস্পষ্ট ঘোষণাপত্র।

> "১. গল্পে আমরা আমাদের কথাই বলব।
> ২. আমরা এখন বাস্তবতায় ক্লান্ত
> ৩. অতীতের মহৎ সৃষ্টি অতীতের কাছে মহৎ আমাদের কাছে নয়।
> ৪. গল্পে এখন যারা কাহিনী খুঁজবে তাদের গুলি করা হবে"।

শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের মূল চেতনা গভীর দার্শনিক প্রতীতি ও সাহিত্যের প্রথাগত কাঠামো ভাঙার এক নতুন সাহসী প্রয়াস। 'এই দশক' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় উদ্ধৃত চারটি বাক্যের মধ্যে প্রথম দুটি বাক্য শাস্ত্রবিরোধী লেখকদের নিজেদের রচনা, যা শুধু প্রথা ভাঙার সাহস নয়, বরং নতুন গল্প কাঠামোর উদ্ভাবনের ইঙ্গিত দেয়। এই বাক্যগুলোতে সমাজের বাস্তবতা থেকে উদ্ভূত নতুন দৃষ্টিভঙ্গির স্পষ্ট পরিচয় মেলে। শাস্ত্রবিরোধী লেখকরা শুধুমাত্র কাহিনি পুনর্নির্মাণে সীমাবদ্ধ থাকেননি; বরং তাঁরা তাঁদের নিজেদের জীবন ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সাহিত্যের নতুন রূপ ও আঙ্গিকের সন্ধান করেছেন।

প্রথম উদ্ধৃত বাক্যে তাঁদের নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা বলার মধ্যে নতুন আঙ্গিক গড়ার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। দ্বিতীয় উদ্ধৃতি, যা আর্তোর-এর লেখার বাংলা অনুবাদ। পূর্বের সাহিত্যে বাইরের সমাজ, ঘটনা, বাস্তব জীবন নিয়ে বেশি লেখা হতো। কিন্তু একসময় লেখকদের মনে হলো, শুধু বাইরের বাস্তবতা দেখালে অন্তর্জগতের রহস্যকে উদ্ঘাটন করা যায় না। মানুষের মনের ভেতরেও অনেক জটিলতা, কষ্ট, অস্থিরতা আছে। তাই তারা সেই অন্তর্জগত বা মনের ভেতরের জগত নিয়ে লিখতে শুরু করেন। শাস্ত্রবিরোধী লেখকরা ঠিক একই পথ অনুসরণ করে বলেছেন, 'আমরা এখন বাস্তবতায় ক্লান্ত' ('এই দশক' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদ )। উদ্ধৃত বাক্যগুলোর মধ্যে শেষ দুটি উদ্ধৃতি সাহসী বক্তব্য , যেখানে মার্ক টোয়েনের পরিহাসাত্মক বক্তব্যটি ছিল বাস্তবতাবর্জিত , সরল পরিহাসের নিদর্শন। 'The Adventures of Huckelberry Finn' গ্রন্থে মার্ক টোয়েন একটি অভিনব ও মজার নোটিস ছেপেছিলেন–

> "Persons attempting to find a motive in this narrative will be prosecuted, persons attempting to find a moral in it will be banished, persons attempting to find a plot in it will be shot."[২]

'এই দশকে'র প্রচ্ছদে মুদ্রিত 'গল্পে এখন যারা কাহিনী খুঁজবে তাদের গুলি করা হবে' মার্ক টোয়েনের উদ্ধৃতাংশের শেষ বাক্যটির এটি বাংলা রূপান্তর, তবে এখানে তার স্বরভঙ্গি বদলে গেছে। টোয়েনের লেখায় যে সহজ, হালকা পরিহাস আছে, এখানে তা অনুপস্থিত; বরং উদ্ধৃতিটি ব্যবহৃত হয়েছে গম্ভীরতা ও তাৎপর্যের সঙ্গে। অর্থাৎ, শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য-আন্দোলনকে এই ধারার লেখকেরা গভীর গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। প্রচ্ছদের সংকল্পবাক্য—'গল্পে আমরা আমাদের কথাই বলব'—এ 'আমাদের কথা' বলতে বহির্জগতের কথা নয়, অন্তর্জগতের অভিজ্ঞতাকেই বোঝানো হয়েছে।

শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য আন্দোলনের সার্বিক পরিচয় পাওয়া যায় 'এই দশকে'র পঞ্চম সংখ্যায় প্রকাশিত রমানাথ রায়ের 'খোলা চোখ ও শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য ' শীর্ষক আলোচনায়। রমানাথ রায় শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্যের দশবিধি প্রণয়ন করেছেন। এই দশ বিধি মূলত প্রচলিত শিল্পসাহিত্য ধারণার বিরুদ্ধে এক ধরনের জেহাদ ঘোষণা করে:

> "১. শিল্পের রাজ্য থেকে সমস্ত তত্ত্ব ও দর্শনের আমূল উৎখাত।

২. যা কিছু এতকাল ছিল গম্ভীর এবং যুক্তিপূর্ণ তাই হাস্যকর।

৩. শিল্প ও সাহিত্যে শাস্ত্রসম্মত পথকে বর্জন করতে হবে। শিল্পের ইতিহাস আঙ্গিকের বিবর্তনের ইতিহাস।

৪. জীবন সম্পর্কে কোনো রকমের স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ধারণা করা বা মত দেওয়ার আমরা বিরোধী।

৫. সৎ, অসৎ, বিশ্বাস, অবিশ্বাস, পাপ-পুণ্য ইত্যাদির ধারণা রীতিমতো সংস্কারাচ্ছন্ন এবং বিরক্তিকর। এসব শব্দ এখন আমাদের কাছে একেবারে অর্থহীন।

৬. পরীক্ষামূলক সাহিত্য কথাটা নির্বোধের উক্তি। সাহিত্য আর যাই হোক গবেষণাগার নয়।

৭. মহৎ সাহিত্য বা চিরকালের সাহিত্য বলে কোনো সাহিত্য নেই, সব সাহিত্য নিজের কালের ও যুগের।

৮. গল্প ও উপন্যাস থেকে পারিবারিক , সামাজিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক বা আঞ্চলিক সমস্যা , মনস্তত্ত্ব, প্রেম বা অপ্রেম, ভাবুকতা এবং বুদ্ধিমত্তাকে বর্জন করতে হবে।

৯. সাহিত্য থেকে সেকেলে কার্যকারণবাদকে ছুঁড়ে ফেলা হোক।

১০. সাহিত্য দীর্ঘদিনের সংস্কার ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত হোক।”[৩]

রমানাথ রায়ের এই কথাগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল প্রচলিত সাহিত্যিক নিয়ম ভেঙে নতুন ধারার সাহিত্য গড়ে তোলা। এই আন্দোলনের পরিকল্পনা ও তাত্ত্বিক রূপ বিশ্লেষণের প্রক্রিয়ায় রমানাথ রায়ের নাম প্রাধান্য পেয়েছে , তবে এ আন্দোলনের চিন্তা বহু লেখকের সম্মিলিত চিন্তার ফল। রমানাথ রায় ‘শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য’র দশবিধি প্রকাশের পর বলেন,

> “গতকাল পর্যন্ত আমরা ছিলাম অন্ধ। ছিলাম শাস্ত্রের হাতে বন্দী। আজ থেকে আর কোনো তত্ত্ব দিয়ে নয়, খোলা চোখে সব কিছু দেখব। সমস্ত সংস্কারকে বর্জন করব। পুড়িয়ে ফেলব সমস্ত শাস্ত্রকে।”[৪]

এই আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রচলিত প্রথা ও শাস্ত্র নির্দেশিত পথ থেকে বিচ্যুতি , যা সৃষ্টিশীলতার মূল হিসেবে গৃহীত। শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য আন্দোলনের লেখকরা খোলা চোখে সব কিছু দেখে শাস্ত্রের নিয়ম ভেঙে সাহিত্যের নতুন পথ নির্মাণের চেষ্টা করেন। শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের কয়েকজন লেখকবৃন্দ হলেন সুব্রত সেনগুপ্ত, রমানাথ রায়, শেখর বসু, কল্যাণ সেন, আশিস ঘোষ, অমল চন্দ, বলরাম বসাক, সুনীল জানা। এই আন্দোলনের মূল কর্ণধার ছিলেন রমানাথ রায়।

রমানাথ রায় ১৯৪০ সালের ৩ জানুয়ারি কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আদি বাড়ি বাংলাদেশের যশোরে হলেও কলকাতার সাহিত্যজগতেই তাঁর লেখকজীবনের বিকাশ ঘটে। তাঁর ছোটগল্পে নাগরিক জীবন, মহানগর কলকাতার সামাজিক বাস্তবতা, মানসিক জটিলতা এবং শহুরে অস্তিত্ববোধ এক গুরুত্বপূর্ণ মোটিফ হিসেবে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রচলিত ধারা থেকে নিজেকে সরিয়ে তিনি সাহিত্যের এক বিকল্প পথের সন্ধান করেছিলেন, যেখানে ফ্যান্টাসি ও বাস্তবতার মিশ্রণে তিনি গড়ে তুলেছিলেন এক নতুন ধারার গল্প। তাঁর লেখার মূল আকর্ষণ ছিল প্রথাগত প্লটের অনুপস্থিতি। রমানাথের বিশ্বাস ছিল , প্লট সবসময় কার্য-কারণের ওপর নির্ভরশীল এবং সেই নির্দিষ্টতা লেখাকে সংকীর্ণ করে তোলে। তিনি সেই পরিণতিকে অস্বীকার করে স্বতঃস্ফূর্ততার মাধ্যমে নতুন এক সাহিত্যিক দর্শন প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর গল্প যেন এক ক্যালাইডোস্কোপ , যেখানে প্রতিটি মুহূর্ত

বিচ্ছিন্ন, অসংলগ্ন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিস্ময়কর। প্লটের ধারণা থেকে সরে গিয়ে তিনি গল্পের আঙ্গিকে , ফর্মে ও বিষয়বস্তুর উপস্থাপনায় যে অভিনবত্ব এনেছিলেন, তা বাংলা সাহিত্যে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে।

রমানাথ রায় প্রচলিত সাহিত্য রীতি ও মানদণ্ডকে অস্বীকার করলেও সাহিত্যের শিল্পসৌন্দর্যকে কখনোই অস্বীকার করেননি। তাঁর রচনায় এই দ্বৈত প্রবণতা স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়। একদিকে তিনি প্রচলিত সাহিত্যের কাঠামো ও নিয়মের বিরোধিতা করেছেন, অন্যদিকে সাহিত্যকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও ভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। তাঁর 'শ্রেষ্ঠ গল্প' সংকলনে অন্তর্ভুক্ত আঠাশটি গল্পের প্রত্যেকটিই যেন আমাদের জীবনের প্রতিচ্ছবি। একাশি বছরের জীবনে, প্রায় ষাট বছরের নিরন্তর সাহিত্য সাধনার দ্বারা পাঠককে তাঁর লেখার প্রতি আকৃষ্ট করেছেন কিন্তু পাঠকের আত্মতৃপ্তির তেমন কোনো ব্যবস্থাই করেননি। অথচ তিনি ২৩৫ টি ছোটগল্প, প্রায় বারোটি উপন্যাস এবং বেশ কিছু মননশীল প্রবন্ধে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। গল্পগুলিতে কোনো প্রচলিত কাহিনির গঠন বা নাটকীয়তা নেই বরং কথোপকথনের ভেতর দিয়েই গল্পের অগ্রগতি ঘটে। উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি হল– 'বলার আছে', 'তক্তপোষ', 'গোগ', 'কোকো', 'জাল কলকাতা', 'তিন তলার ঘর', 'সেলাই মেশিন', 'লোলা বিয়ার খায়', 'কাজের লোক', 'ফাঁসির আগের দিন', 'কাঁকর', 'ফিরে এলেন মহাদেব', '৩৪-২৪-৩৬', 'বউ রান্না করে', 'রাখাল বসুর ইচ্ছাপূরণ', 'হৃৎপিণ্ড', 'স্বেচ্ছামৃত্যু', 'বিদ্যাসাগর ও ভানু পাল', 'রামচরণ সরণি', 'হে অরণ্যদেব', 'দু'ঘণ্টার ভালোবাসা' প্রভৃতি।

রমানাথ যেন খুব সাধারণ মানুষদের সাধারণ দিনযাপনের ভেতরেই অসাধারণ এক সত্য আবিষ্কার করেন। পাঠক প্রথমে হদিশ পান না, কোথা থেকে গল্প শুরু হলো বা কোন দিকে এগোচ্ছে; কিন্তু গল্পের শেষে পৌঁছালে বোঝা যায়, এই অনির্দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রাই ছিল জীবনের গভীরতম উপলব্ধির পথ। শাস্ত্রবিরোধী ছোটোগল্প আন্দোলনের মুখপত্র 'এই দশক' (১৯৬৬) পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংকলনে 'শাস্ত্রবিরোধী ছোটগল্প' শিরোনামের সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল–

> "সময় হয়েছে যা কিছু পুরনো তাকে বর্জন করবার, সময় হয়েছে যা কিছু নতুন তার জন্য প্রস্তুত হবার। আলমারি থেকে সব বই নামিয়ে ফেলো। আমাদের জন্য এবার একে একে তাকগুলো খালি করে দাও। তথাকথিত মহৎ উপন্যাস এবং গল্পগুলোকে তাড়াতাড়ি ট্রাঙ্কে পুরে ফেলো। ওগুলো আর দরকার নেই। ওগুলো এখন আবেদনহীন এবং বিরক্তিকর।"[৫]

প্রথম জীবনে প্রকাশিত প্রথম গল্পগ্রন্থ 'ক্ষত এবং অন্যান্য গল্প'তে রমানাথ রায় নিজের শ্রেণির আভাস দিতে পেরেছিলেন। যেহেতু মানুষের জীবনের সমস্যা নানা রকম মিশ্র, জটিল ও অনির্দিষ্ট তাই লেখক তাঁর গল্পে কোনো একটি নির্দিষ্ট সমস্যা বা বিষয়কে আলাদা করে দেখাতে চাননি। বরং জীবনের বাস্তবতার মতোই গল্পের ঘটনাগুলিও বহুমুখী ও বহুরৈখিক হয়েছে। এই কারণে তাঁর গল্পে দেখা যায়– ব্যক্তিগত জীবনের টানাপোড়েন ও মানসিক দ্বন্দ্ব, সামাজিক সম্পর্কের জটিলতা ও ভাঙন, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও বেঁচে থাকার সংগ্রাম, ভালোবাসা, বিশ্বাস ও প্রতারণার সূক্ষ্ম অনুভূতি, মানুষে মানুষে দূরত্ব ও একাকীত্বের বেদনা। সব মিলিয়ে গল্পে জীবনের নানা

দিক একসূত্রে গাঁথা হয়েছে যা কোনো একক সমস্যার বিষয় নয়, বরং মানুষের অস্তিত্বের বহুমাত্রিক বাস্তবতার প্রতিফলন।

**'৩৪-২৪-৩৬'** গল্পে দেখানো হয়েছে ঝকঝকে বিজ্ঞাপনের প্রভাব সাধারণ মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। গল্পে রুমি চরিত্রের মাধ্যমে গল্পকার দেখাতে চেয়েছেন বিজ্ঞাপনের নেশায় নিজেকে সুন্দর উপস্থাপিত করার জন্য রুমি বার বার চেষ্টা করছেন। কথক যখন রুমিকে জিজ্ঞেস করে যে তার দাঁত এত সুন্দর হল কি করে? তার জবাবে রুমি জানায়-

> "–এর কারণ নিউ ম্যাকলিনস। মেকলিনস ফ্রেশমেন্ট দাঁত সাদা আর শক্ত করে তোলে।"[৬]

টিভি সংবাদ মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দেখে মানুষ সমাজ নির্ধারিত সৌন্দর্য্যের মাপকাঠিতে নিজেকে তুলনা করছে। এতে কোথাও যেন মানবতাবোধ মনের সৌন্দর্য, চরিত্রের সরলতা ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। খাঁটি মানুষ আর কেউ চায় না তার বদলে বাইরের সাময়িক সৌন্দর্য বর্তমানে সমাজের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

রমানাথ রায়ের সাহিত্যচেতনা ছিল সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতির গভীর উপলব্ধিতে প্রোথিত। তিনি বিশ্বাস করতেন সাহিত্য মানুষের চিন্তাকে পরিবর্তিত করতে পারে এবং সমাজে ইতিবাচক রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম। তাঁর লেখায় জনগণের সংগ্রাম, রাজনৈতিক নিপীড়ন এবং বুদ্ধিজীবী সমাজের অন্তর্দ্বন্দ্ব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এরকমই একটি গল্প **'কাঁকর'** । যেখানে গল্পে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের আকারে রেশন দুর্নীতির কথা বলা হয়েছে। 'কাঁকর' গল্পের মুখ্য চরিত্র হরিবাবু। তাঁর এক অদ্ভুত অভ্যাস আছে-তিনি কাঁকর খেতে খুবই পছন্দ করেন। তাই তাঁর স্ত্রী রেশনের চাল থেকে কাঁকর বেছে আলাদা করে রাখেন এবং হরিবাবু ভাত খেতে বসলে সেগুলো তাঁর পাতে তুলে দেন।

> "রেশনের চাল কাঁকরের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য সারাদেশের বিভিন্ন জায়গায় কাঁকর তৈরীর কারখানা খোলা হবে। এর জন্যে প্রায় সাতান্ন কোটি টাকা খরচ হবে।"[৭]

গল্পে খাদ্যসংকট, ভেজাল খাদ্য ও সরকারি উদাসীনতাকে তীব্র ব্যঙ্গের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। দরিদ্র মানুষের দুর্দশার বিপরীতে শাসকগোষ্ঠীর দায়িত্বহীনতাই এখানে প্রধানভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

**'সেলাই মেশিন'** গল্পে দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমিতাকে দেখানো হয়েছে। গল্পে দেখা যায় সময় বদলাচ্ছে, মানুষ বদলাচ্ছে কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে কোন বৈচিত্র্য নেই, একই রকম ভাবে চলছে।

> "সেই এক কথা। এক উত্তর। আমার সব মুখস্ত। এরপর কি হবে তাও জানি। এরপর ছেলে আর কিছু বলবে না। সত্যি, কিছু বলল না। বৌমা চুপ করে থাকবে। সত্যি, বৌমা চুপ করে থাকলো। আমি মনে মনে হাসলাম। আমার সব জানা।"[৮]

রমানাথ রায়ের এই গল্পে কোনো ধরাবাঁধা বৃত্তাকার কাহিনি নেই। এখানে সেলাই মেশিনকে আধুনিক জটিল জীবনের এক গূঢ় মনস্তাত্ত্বিক প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করে মানুষের অপূর্ণ দাবি ও চরম অসহায়তাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মেশিনটিকে কেন্দ্র করে তিন প্রজন্মের পাঁচটি মৃত্যুকে দেখানোর মাধ্যমে এর ওপর এক গভীর

মৃত্যু-প্রতীকী আরোপ করা হয়েছে। পুরো গল্পে অ্যাবসার্ড রীতির স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ করা যায়, যেখানে সম্পর্কের জটিল বিন্যাস আর ঘটনার পৌনঃপুনিক আবর্তনের মধ্য দিয়ে কাহিনী এগিয়ে চলে। গল্পের শেষে চেতন ও অবচেতন মনে সেলাই মেশিনের সেই নিরন্তর 'ঘর ঘর' শব্দ আর কোনো অদৃশ্য মানুষের উপস্থিতি এক পরাবাস্তব আবহ বা অ্যাবসার্ডনেসের জন্ম দেয়। এছাড়াও প্রবহমান আখ্যান রীতি অগ্রাহ্য করে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের আখ্যান বলয়কে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য রমানাথ তাঁর গল্পে এক পুনরাবৃত্তিমূলক আবর্তনশীল ক্রম অনুসরণ করেছেন। রমানাথ রায়ের এই গল্পে প্লট বদলায় না কিন্তু চরিত্ররা বদলে যায়। এবং এটিই তাঁর সমগ্র সাহিত্য রচনার মূল বিষয়।

**'তিনতলার ঘর'** গল্পে বাড়তি কোনো কথা নেই, কোনো চোরাগোপ্তা ভাষারও আশ্রয় নেওয়া হয়নি। গল্পে বৃদ্ধটি নিজের মনের কথা বলতে শুরু করেন এইভাবে–

> "সবসময় একা থাকতে ভালো লাগে না। বুড়ির সঙ্গে কোনো কোনো দিন একটু কথা বলতে ইচ্ছে করে।"[৯]

বৃদ্ধ তার নাতনি, ছেলের বউ, ছেলে–সবার কাছে একটিই অনুরোধ জানান: বুড়ি যেন একবার তার কাছে আসে। কিন্তু নানান অজুহাতে বুড়োর সঙ্গে বুড়ির আর দেখা হয় না। এত সামান্য একটি বিষয়ও যে একজন মানুষের ব্যক্তিজীবনে গভীর ট্র্যাজেডি হয়ে উঠতে পারে, তা 'তিনতলার ঘর' গল্পটি না পড়লে পুরোপুরি বোঝা যায় না। নিঃসঙ্গতা ও একাকীত্ব এই গল্পের মূল সুর। আরেকটি বিষয় লক্ষ করার মতো যা উহ্য থাকলেও গল্পে প্রকাশিত ভাবনায় তা ধরা পড়ে; তা হল বার্ধক্যে পৌঁছে মানুষের যখন কর্মদক্ষতা কমে যায় তখন পরিবারে অন্যান্য সদস্যদের কাছে তার মূল্যও কম হয়ে যায়। এই ভাবটি ফুটে ওঠে যখন বৃদ্ধ বলেন–

> "একেক দিন আমার নিচে নেমে যেতে ইচ্ছে করে। ওদের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে। কিন্তু আমার কথা কে শুনবে? আমার কি বলার আছে।"[১০]

রমানাথ রায়ের সাহিত্যে জাদুবাস্তবতার প্রসঙ্গ রয়েছে। জাদুবাস্তবতা মূলত ঔপনিবেশিক ইতিহাস থেকে উঠে আসে, যা আমাদের সাহিত্যিক প্রেক্ষাপটে খাপ খায় না। তবে রমানাথ রায়ের লিখনশৈলীতে এক অনন্য রূপ পায়, যেখানে তাঁর গল্পের জাদু লুকিয়ে থাকে বাস্তবতার ভেতরে।

**'ফিরে এলেন মহাদেব'** গল্পটি মূলত রাষ্ট্র বনাম ব্যক্তির সংঘাতের গল্প। এখানে মহাদেব মিত্র একজন নিঃসঙ্গ, অবসাদগ্রস্ত বৃদ্ধ, যিনি আত্মহত্যা করতে গিয়ে মাটিতে না পড়ে হাওয়ায় ভেসে থাকেন। এই অলৌকিক ঘটনাকে ঘিরে সাধারণ মানুষ তাঁকে দেবতা বা যোগী বলে ভাবতে শুরু করে, আর দ্রুত নানা গুজব ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু গল্পের আসল তাৎপর্য এই অলৌকিকতায় নয়, বরং এই ঘটনাকে ঘিরে রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়ায়। রাষ্ট্র একজন অসহায়, শক্তিহীন বৃদ্ধকেও সন্দেহের চোখে দেখে এবং তাঁকে সন্ত্রাসবাদী বা গণঅভ্যুত্থানের পরিকল্পনাকারী বলে ভাবতে শুরু করে। এর মধ্য দিয়ে লেখক দেখিয়েছেন, রাষ্ট্র কতটা ভীতু, সন্দেহপ্রবণ এবং নিয়ন্ত্রণহীন পরিস্থিতিকে কত সহজে বিপজ্জনক বলে মনে করে। হাস্যরসের মোড়কে গল্পটি তাই রাষ্ট্রের অমানবিকতা ও

ভীরুতাকে তীব্র ব্যঙ্গের সঙ্গে প্রকাশ করেছে। গল্পের শেষে মহাদেব আবার নিজের বাড়িতে ফিরে আসেন এবং তাঁর বাঁচার ইচ্ছে জেগে ওঠে। তাই এই গল্প শুধু ব্যঙ্গ নয়, জীবনের দিকেও ফিরে আসার গল্প।

শাস্ত্রবিরোধী লেখক রমানাথ রায় এই গল্পে জাদুবাস্তবতার অভিনব প্রয়োগের মাধ্যমে এক স্বতন্ত্র শিল্পভাষা নির্মাণ করেছেন। তিনি প্রচলিত সাহিত্যের বাঁধাধরা নিয়মকে অগ্রাহ্য করে গল্পকে মুক্ত এবং স্বতঃস্ফূর্ত এক রূপ দিতে চেয়েছেন। বাস্তবতার পাশাপাশি তিনি স্বপ্নময়তা ও কল্পলোকের উপাদানকে সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। সেই সঙ্গে তাঁর লেখায় ফ্যান্টাসির সংযোজন গল্পকে আরও বিস্ময়ময় করে তুলেছে। স্বপ্ন, কল্পনা, ফ্যান্টাসি এবং বাস্তবের এই মেলবন্ধনের মধ্য দিয়েই তিনি জাদুবাস্তবতার আবহ সৃষ্টি করেছেন। ফলে গল্পে যেমন এক অনন্য চমক তৈরি হয়েছে, তেমনি সমাজবাস্তবতার কঠোর মাটিতেও তিনি জাদুর তীব্র আঘাত হেনেছেন।

> “মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব অনুযায়ী তার শরীর রাস্তায় আছড়ে পড়ার কথা। কিন্তু তা হলো না। তার শরীর রাস্তায় আছড়ে না পড়ে শূন্যে ভাসতে লাগলো।”[১১]

তাই আমরা দেখতে পাই গল্পের মূল চরিত্র মহাদেব মিত্র নিঃসঙ্গ জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় আট তলার ঘর থেকে নিচে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করতে যান তবে তার শরীর নিচে না পড়ে আকাশে ভাসতে থাকে যা মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের বিপরীত।

উপসংহারে বলা যায়, শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন বাংলা ছোটগল্পে এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় পরিবর্তনের সূচনা করেছিল, আর সেই আন্দোলনের কেন্দ্রীয় শক্তি হিসেবে রমানাথ রায় নিজস্ব সাহিত্যদর্শন ও অভিনব আঙ্গিকের মাধ্যমে বাংলা কথাসাহিত্যে এক স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করেন। তাঁর গল্পে ভাষা চয়নে সেই অভিনবত্বের ছাপ আমরা দেখতে পাই। কাহিনির পাশাপাশি গল্পের ভাষা এবং স্টাইল পাঠককে আকৃষ্ট করেছে। তিনি প্রচলিত কাহিনিনির্ভর গল্পরীতিকে অস্বীকার করে মানুষের অন্তর্জগৎ, বিচ্ছিন্নতা, সামাজিক সংকট, দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমি, রাষ্ট্রীয় ভীতি, এবং অস্তিত্বের অনিশ্চয়তাকে নতুনভাবে প্রকাশ করেছেন। তাঁর গল্পে বাস্তব, স্বপ্ন, কল্পনা, ফ্যান্টাসি, অ্যাবসার্ডনেস এবং ব্যঙ্গ একসঙ্গে মিলেমিশে এমন এক শিল্পরূপ নির্মাণ করেছে, যা বাংলা ছোটগল্পকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। ‘ফিরে এলেন মহাদেব’, ‘কাঁকর’, ‘সেলাই মেশিন’ বা ‘তিনতলার ঘর’-এর মতো গল্পে আমরা দেখি, সাধারণ জীবনের সামান্য ঘটনাও তাঁর হাতে গভীর সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক তাৎপর্য লাভ করেছে। তাই রমানাথ রায়ের ছোটগল্প শুধু শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের দলিল নয়, বাংলা সাহিত্যে নতুন চিন্তা, নতুন ভাষা এবং নতুন শিল্পবোধেরও উজ্জ্বল নিদর্শন।

**তথ্যপঞ্জি:**

১. দাস উত্তম, *হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন*, দক্ষিন ২৪ পরগনা: মহাদিগন্ত, ১৯৮৬, পৃ.১২২
২. তদেব, পৃ. ১২২
৩. তদেব, পৃ. ১৩৪
৪. বন্দ্যোপাধ্যায় সৌম্যব্রত সম্পাদিত, *শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন*, কলকাতা: গাঙচিল, ২০১৮, পৃ.৫১
৫. দাস উত্তম, *হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ.১২০

৬. রায় রমানাথ, শ্রেষ্ঠগল্প, কলকাতা: বাণীশিল্প, জানুয়ারি ২০২১, পৃ. ৩৩

৭. তদেব, পৃ. ৩২

৮. তদেব, পৃ. ১৭

৯. তদেব, পৃ. ৯

১০. তদেব, পৃ. ১১

১১. তদেব, পৃ. ১৭১